প্রবীণ ভাবনা
নবীনের আগামী

হাসান আলী

QK Ahmad Foundation
কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায়

কিউ কে আহমদ ফাউন্ডেশন
বাড়ি-৫০, সড়ক-৮, ব্লক-ডি, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৭১৪০৬৩৩৫০
Website: www.qkaf.org. Email: qkaf.org@gmail.com

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২২

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১১০, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ষাট টাকা

ISBN 978 984 8143 89 6

ভূমিকা

প্রবীণদের সংখ্যা বাংলাদেশে দ্রুত বাড়ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশের মত প্রবীণ অর্থাৎ ষাটোর্ধ। ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২১ শতাংশের মতো। ততক্ষণে তরুণদের অনুপাত প্রবীণদের অনুপাতের তুলনায় কিছু কম হয়ে যাবে। তাই বর্তমানের জনমিতিক সুযোগ তখন জনমিতিক বিরূপ অবস্থায় রূপান্তরিত হবে। প্রবীণ বিষয় তাই জাতীয় ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সরকার ইতোমধ্যে একটি প্রবীণ নীতি (২০১৩) এবং মাতা-পিতার ভরণপোষণ আইন (২০১৩) করেছে। কাজেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সচেতনতা রয়েছে এ বিষয়ে। তবে বাস্তবায়নে অগ্রগতি এখনও তেমন হয়নি। অবশ্য এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর শেষবেলার জীবন মানবিক ও স্বস্তির রাখা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে দেশে এমন একটি সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা তৈরি হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট, আগ্রহী এবং দায়বদ্ধ অন্য সকলে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

নিজের মাতা-পিতা তো বটেই, অন্যান্য প্রবীণের প্রতি তরুণ প্রজন্মের সহানুভূতিশীল আচরণ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তারাও একদিন প্রবীণ হবে শুধু একথা বিবেচনায় নিলেও। এছাড়া মাতা-পিতার শেষ জীবন যাতে স্বস্তির এবং যথাযথ মর্যাদার হয় সেজন্য সন্তান হিসেবে তাদের দায়িত্ব এবং করণীয় রয়েছে। এই মাতা-পিতাই তাদেরকে লালন-পালন করেছেন যখন কান্না করা এবং হাত-পা নাড়া ব্যতীত তাদের আর কোনো কিছু করার সামর্থ্য ছিল না। পরবর্তীতে তাদের সুন্দর জীবন গড়ে দিতে মাতা-পিতা যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আর সব প্রবীণই তাদের কর্মকালে শ্রম দিয়ে পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি যথাসম্ভব অবদান রাখেন। কাজেই প্রবীণদের প্রতি তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

এই বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধগুলো প্রবীণ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা (পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে তাদের প্রতি অবহেলা, তাদের প্রতি কর্তব্য পালন না করা,

তাদের সুস্থতার দিকে নজর না দেয়া, তাদের একাকিত্ব দূরীকরণে সচেষ্ট না হওয়া ইত্যাদি), চাহিদা, রোগ-বালাই এবং অন্যান্য বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

কিউ কে আহমদ ফাউন্ডেশন প্রবন্ধগুলো বই আকারে প্রকাশ করছে প্রতিষ্ঠানটির 'নৈতিকতা, মূল্যবোধ, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেম কর্মসূচির' আওতায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণদের মধ্যে প্রবীণ জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং মাতা-পিতা এবং সাধারণভাবে প্রবীণদের শেষ জীবন যাতে স্বস্তির ও মর্যাদার হয় সেই লক্ষ্যে তাদেরকে সচেতন দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা। পুস্তকটি ফাউন্ডেশনের উপর্যুক্ত প্রকল্পের আওতায় যত শিক্ষার্থী আসবে তাদেরকে দেয়া হবে এবং এ বিষয়ে তারা কতটুকু জেনেছে এবং বুঝেছে তা বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হবে। ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অন্যান্য বিষয়সহ প্রবীণ সংক্রান্ত এসকল ধারণা ও করণীয় ব্যাপকভাবে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

আমি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলির লেখক হাসান আলীকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আগস্ট ২০২২

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান
কিউ কে আহমদ ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

- যৌবন সুন্দর প্রবীণ জীবনও সুন্দর হতে পারে ৭
- বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গতা এক দুঃসহ যন্ত্রণা ১১
- বৃদ্ধ বয়সে মা ও সন্তানের সম্পর্ক ১৫
- বৃদ্ধ বয়সে বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক ১৮
- প্রবীণ প্রতিবন্ধী : একটি মানবিক চ্যালেঞ্জ ২১
- প্রবীণের পুষ্টি সমস্যা এবং করণীয় ২৪
- বাস-ট্রেন-লঞ্চে প্রবীণের চলাচল বিড়ম্বনা ২৮
- আলঝেইমার রোগ এবং করণীয় ৩২

১

যৌবন সুন্দর
প্রবীণ জীবনও সুন্দর হতে পারে

ছেলেবেলায় আমার দাদি বলতেন, 'ত্রিশে বিদ্যা চল্লিশে ধন, না হলে ঠনঠন।' প্রবীণরা তাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, নির্দিষ্ট একটা বয়সে পড়াশোনা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। তা না হলে জীবন নানা ধরনের জটিলতায় পড়ে। স্বস্তিময় জীবনযাপন করা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকমতো যত্ন-আত্তি, ভালোবাসা ছাড়া শিশু বড় হতে শুরু করলে শৈশব-কৈশোরে এর প্রভাব পড়ে। শৈশব-কৈশোরে অবহেলা-অযত্নে বড় হলে যৌবনে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রশ্নবিদ্ধ যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে সীমাহীন সংকটে পড়ার শঙ্কা থাকবে। মর্যাদাপূর্ণ, স্বস্তিদায়ক প্রবীণ জীবনের জন্য মাতৃগর্ভে শিশুর আগমন থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মা-বাবার সুস্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে সন্তান সুস্থভাবে জন্মলাভ করতে পারবে কি-না? সুস্থভাবে জন্মলাভ করা সন্তান মা-বাবার সেবাযত্নে, স্নেহমমতায় বড় হবে, এটা সবাই চায়। তবে সমাজে নানা কারণে অনেক সময় শিশু আপনজনের স্নেহ-মমতা ছাড়াই বড় হতে থাকে।

শারীরিকভাবে বড় হয়ে ওঠা শিশু মানসিক যাতনায় ভোগে। আমরা আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দিতে পারছি না। কোনো কোনো শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার, আবার কোনো কোনো শিশু অতিপুষ্টির শিকার। এভাবেই ভারসাম্যহীন শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে আগামী দিনের প্রজন্মের অনেকে গড়ে উঠছে। একদিকে বিত্তহীন কিংবা নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা স্বাস্থ্য-শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ছে; আরেক দিকে অতি সতর্কতার নীতি নিয়ে শিশুর ওপর শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত। শিশু বয়সেই যেন সবকিছু আয়ত্ত করতে পারে। সব পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে যেন তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারে, চলছে তার আয়োজন। সমাজে আমাদের শিশুরা এভাবেই বিভাজন আর বিভক্তি নিয়ে বড় হচ্ছে। ফলে শিশুর অবচেতন মনেই জন্ম নিচ্ছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, রাগ, জেদ, ক্ষোভ ইত্যাদি। পারিবারিক ও সামাজিক সংকট শিশুমনে ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি করে।

এ ব্যথা-বেদনাকে প্রশমিত করার জন্য আমাদের পরিবার ও সমাজে মনোযোগ খুবই কম। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় ক্ষতি হবে মনে করে তাদের খেলাধুলা, গানবাজনা, লেখালেখিতে মা-বাবা তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। তাদের কাছে সাধারণত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তারা ছেলে-মেয়েদেরকে গড়ে তোলার চেয়ে অর্থবিত্তে ক্ষমতাবান সেই আগ্রহই বেশি। কী করে ধনসম্পদ এবং মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ বেশি করে করা যাবে, সে চিন্তায় অনেকেই বিভোর। মানুষের মধ্যে সুখের ভাবনা তৈরি হয় বস্তুগত সুখ দিয়ে। শরীরকে সুখী করতে পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর ব্যবহার পরম কাম্য হয়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় থাকে। পরাজিতদের মধ্যে হাহাকার তৈরি হয়। জয়ীদের হাসি-উচ্ছ্বাস সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। ঘৃণার আগুন ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। অশান্তির ডানা ঝাপটে ওঠে। সৃষ্টি হয় গভীর শূন্যতা। এ শূন্যতা যুব মনে অনেক সময় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। স্বার্থ হাসিলের জন্য সম্পর্ক ভেঙে টুকরা টুকরা করে ফেলি। দিবস পালনসহ নানা অজুহাত দেখিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক মজবুত করার মহড়া চলে। কিন্তু সম্পর্কের শূন্যতা পূরণ হয় না।

চেনা ছেলে-মেয়েরা ক্রমেই অচেনা হতে থাকে। আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়। হঠাৎ করে সংবাদ শিরোনাম হয়ে তাক লাগিয়ে দেয় কিংবা বুকভাঙা হাহাকার তীব্র হয়ে ওঠে। শুধুই বিচ্ছিন্নতা! এ বিচ্ছিন্নতা শুধু আপনজন থেকে। অচেনা, অদেখা মানুষ ক্রমেই আপন হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অনেকেই এই অচেনা-অদেখাদের হাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত তুলে দেয়। অনেকেই মনে করতে পারে না, শেষ কবে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বসে দুপুর কিংবা রাতের খাবার সেরেছেন। যৌবনে থাকা মানুষ অভিযোগ, নালিশ, সুপারিশ, প্রতিযোগিতা, সেরা হওয়ার ভাবনা ইত্যাদিতে বেশি করে যুক্ত হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ নবীন পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি ছেলে-মেয়েকে পর্যন্ত সময় দিতে পারছেন না। শুধু নিজকে কতটা উপরে তোলা যায়, সে তাড়না তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

এভাবেই নবীন মানুষ চোখের পলকে প্রবীণ জীবনে প্রবেশ করেন। কর্মযজ্ঞে ৩০ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। ষাটে পা দিয়ে বুঝতে পেরেছেন শরীরটা আর কথা শুনতে চায় না। কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে গেছে। রাত জেগে সফর করেছেন, দিনভর কাজ করেছেন। কখন দিন শেষ হয়েছে বুঝতে পারেননি। ছেলে-মেয়ে

পরিবারের সদস্যদের বড় হওয়া দেখে অবাক হয়েছেন। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার যন্ত্রণা শুধুই কাতর করে তুলছে। চেনা জানা মানুষ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। টেলিফোনটা আর আগের মতো বেজে ওঠে না। পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। অবহেলা, অবজ্ঞা, ক্রমেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনের নতুন চেহারা দেখে হয়তো একটু ভড়কে গেছেন। নিজের শরীরে রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। নিয়মিত ওষুধ খেতে হচ্ছে।

সমাজে লোকজন বলতে শুরু করছে, 'আর কত? এবার পরকালের কথা ভাবেন। কোনদিন ডাক পড়বে তার ঠিক নেই।' চেনাজানা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মৃত্যুর সংবাদ আপনাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে। নিজের ডাক পড়ার সম্ভাবনা ভাবিয়ে তুলবে। নিজের অর্জিত সম্পদের ওপর নিকটতমদের নজর পড়েছে। আপনার সম্পদ আপনার কাছে নিরাপদ নয় বলে স্বজনরা ভাবছে। অথবা কোনো কারণে আপনি সম্পদ অর্জন করতে পারেননি কিংবা সম্পদ হারিয়েছেন। যা-ই হোক, আপনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। যৌবনে যদি আপনি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে সহযোগিতা করার সময় না পেয়ে থাকেন, তবে কেন আপনি তাদের সহযোগিতা আশা করবেন?

আপনার ব্যস্ত জীবনে পরিবারে সবার সঙ্গে খাবার গ্রহণের রেওয়াজ চালু করতে পারেননি। তাই প্রবীণ বয়সে আপনি একা খাবার গ্রহণের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। মানুষ বনজঙ্গল কেটে সাফ করে, তারপর প্রকৃতি রক্ষার নামে বাড়ির ছাদে কিংবা বারান্দার টবে ফুল-ফলের গাছ লাগিয়ে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হয়। যৌবনে শরীরের যথাযথ যত্ন নিলেন না। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন না। মাদক, তামাক গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। বার্ধক্যে এসে শরীর বিদ্রোহ করে উঠতে পারে। শরীরকে নাস্তানাবুদ করে ফেলত পারে। যৌবনে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল করেননি। মনে করেছেন এগুলো কোনো ব্যাপার না। মনের চাওয়া-পাওয়াকে অবহেলা করেছেন। অথবা পরিবারের সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কিংবা চাহিদাগুলোকে তেমন একটা পাত্তা দেননি। আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবারের সদস্যদের ইতিবাচক ভূমিকা না-ও থাকতে পারে।

মা-বাবা, স্বজনদের ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আপনার ভূমিকা সহযোগিতামূলক ছিল? নিজের সন্তান অসুস্থ হলে যতখানি গুরুত্ব দিয়ে

চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসেন, প্রবীণ মা-বাবাকে কি একই গুরুত্ব দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন? আপনি কি নিজের হাতে প্রবীণ মা-বাবার সেবাযত্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছেন? আপনার যৌবনে আপনি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সঠিক বিচার করেছেন? সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে অসহায়দের বুকে তুলে নিয়েছেন? সাহায্যপ্রার্থীদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন? সামাজিক কাজকর্মকে দায়িত্ব-কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন? যদি আপনি এসব কাজ করে না থাকেন, তবে কীভাবে আপনি পরিবার-সমাজের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করেন? প্রবীণের প্রতি অমর্যাদা, অসম্মান, অবহেলা নিরসনে কোনো ধরনের ভূমিকা রেখেছেন? প্রবীণের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছেন? যেনতেন করে শৈশব-কৈশোর-যৌবন পার করে বার্ধক্যে এসে 'বিলাপ' করে অভিশাপ দিলে কোনো লাভ হবে?

নিজের বার্ধক্যকে স্বস্তিময়, আনন্দদায়ক করতে আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় প্রবীণজীবনের বেদনাদায়ক পরিস্থিতি আপনাকে হতবিহ্বল করে দিতে পারে। মানুষ জন্মের পর থেকে প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত চাকরি, ব্যবসায় বা কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। পরবর্তী ৩০ বছর কর্মক্ষেত্রে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করে থাকেন। ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। একজন প্রবীণের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আরও ৩০ বছর হতে পারে। সে ৩০ বছর কাটানোর প্রস্তুতি কী? তাই উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো আগেভাগে অর্থাৎ তরুণ বয়সে, যৌবনে এবং বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়ার আগে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে এবং সে মতে কাজ করতে হবে।

২

বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গতা এক দুঃসহ যন্ত্রণা

নিঃসঙ্গতা সবসময় কষ্টের। কারণ, মানুষ একা থাকতে পারে না। মানুষ এক সময় অর্থাৎ সুদূর অতীতে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করেছিল এক হয়ে। গুহায় থাকতো এবং দলবেঁধে শিকার ও অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতো। পরবর্তীকালে তারা কৃষিনির্ভর জীবনে প্রবেশ করে। তখনও দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়েছে তাদেরকে। সমাজ পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে উন্নততর জীবনের প্রত্যাশায়। মানুষ নিজের প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্জিত সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে অঢেল। কিন্তু পরবর্তীতে আমিত্বের প্রাধান্য সৃষ্টি হতে থাকে। সম্পদ ও ক্ষমতা জমা হতে থাকে ব্যক্তির হাতে। এখন দেখা যায় সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি হয়ে উঠেছে প্রভুর ন্যায়। অশুভ প্রতিযোগিতায় মেতেছে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিতে।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ণ সাফল্য, চিকিৎসা ও প্রযুক্তির উন্নতিতে মানুষের গড় আয়ু ইতোমধ্যে বেড়ে গেছে অনেক। মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সম্পদ অর্জনে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে, নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ নিতে। ফলে তৈরি হচ্ছে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ আর অশান্ত পরিবেশ। আর এসব কারণে কষ্টে পড়ে শিশু, নারী, বৃদ্ধ। জীবিকার জন্য মানুষ সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। কাঁটাতার, গুলি উপেক্ষা করে সীমান্ত অতিক্রম করছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কাছে বলি হচ্ছে মানবতা। উপেক্ষা করছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। ফলে হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তার হাতে মানুষ হয়ে পড়ছে বন্দি।

ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠনের নাম পরিবার। পরিবারে আমরা জন্মলাভ করি; বড় হয়ে উঠি। যৌবনে নিজেরা পরিবার গড়ি। বার্ধক্যে নির্ভরশীল হয়ে অন্য কোনো পরিবার নতুবা 'শূন্য বাসায়' বসবাস। প্রবীণ বয়সে নিঃসঙ্গতা দু'ধরনের। একটি হলো স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধনের অভাব, অপরটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। সাধারণত পুরুষের তুলনায় নারীদেরই অধিক হারে বৈধব্যবরণ করতে হয়। কারণ, বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের বয়স বেশি থাকে। আবার নারীর গড় আয়ু বেশি

অর্থাৎ নারী বেশিদিন বাঁচে। কে বেশি নিঃসঙ্গতায় ভোগে– বিপত্নীক না কি বিধবা? একদল সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, বৈধব্যে একজন প্রবীণ নারী সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে। সমাজ প্রবীণ বিধবার পুনঃবিবাহকে অনেক সময় সমর্থন করে না। একজন বৃদ্ধা তার চেয়ে কমবয়সি কাউকে বিয়ে করাকে ভালো চোখে দেখা হয় না। অন্যদিকে বিপত্নীক বৃদ্ধ সহজেই তার চেয়ে কমবয়সি কোনো বিধবাকে বিয়ে করে নিতে পারেন। কখনো আবার কমবয়সি অবিবাহিত নারীকেও বিয়ে করেন। বিপত্নীক প্রবীণ পুনঃবিয়ের মাধ্যমে নিঃসঙ্গতা মোকাবিলার চেষ্টা করেন। নতুন স্ত্রীর সঙ্গে বেশিরভাগ সময় সখ্যতা, ঘনিষ্ঠতা, নির্ভরশীলতা, আন্তরিকতা গড়ে ওঠে তার।

তবে অনেক সময় সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজনের অসহযোগিতায় এ ধরনের দাম্পত্য জীবন গভীর সংকটের মুখে পড়ে। এতে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দিন দিন বাড়তে থাকে। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের জীবন-সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা কর্মস্থল দূরে থাকায় মা-বাবাকে তেমন একটা সময় দিতে পারে না। বিপত্নীক এবং বিধবা উভয়ই বিরাট একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতায় পড়েন। শূন্য বাসায় বন্দিজীবন কাটানো দুঃসহ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এক বিধবা প্রবীণ অন্য বিধবা প্রবীণকে সমব্যথী হিসেবে গ্রহণ করে কিছুটা স্বস্তি পান। বিয়ে-বিচ্ছেদ হলে নারী-পুরুষ উভয়ই ভয়ানক সংকটে পড়েন। সামাজিক-পারিবারিক সংকট প্রবীণদের নাজেহাল করে তোলে। বিয়ে-বিচ্ছেদের জন্য কে দায়ী, এর চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়। বিপর্যয় ঘটে বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কে। প্রবীণ বয়সে বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা-সমর্থন পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ে।

বিয়ে-বিচ্ছেদ হওয়ায় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। ছেলে-মেয়ে না থাকলে প্রবীণদের সংকট আরও বেশি। আর্থিক সহযোগিতা, ভরণপোষণ, চিকিৎসা, সেবাযত্ন পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তালাকপ্রাপ্ত প্রবীণরা জীবনের শেষ দিনগুলোয় চরম নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। চিরকুমার-চিরকুমারী জীবনের ওপর গবেষণা হয়েছে, তারা বিবাহিত নারী-পুরুষের চেয়ে বেশি অসুখী হয়ে থাকেন। তারা চাকরি থেকে অবসর নিলে মনোবল হারিয়ে ফেলেন। কোথায় কার সঙ্গে থাকবেন এ হিসাবনিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ বয়সে সঠিক পরিচর্যা, সেবাযত্নের অভাবে শরীর ভেঙে পড়ে। নিকটতমদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ কমতে থাকে। ফলে নিষ্ঠুর

একাকিত্ব তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় চিরকুমার বা চিরকুমারী অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে এমন নারী-পুরুষ পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হন।

শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধী প্রবীণদের জীবন ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা-একাকিত্ব গ্রাস করে রাখে। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রবীণ ঘর থেকে কারো সাহায্য ছাড়া বাইরে বেরোতে পারেন না। স্বাধীনভাবে ইচ্ছামতো কোথাও যাওয়া অসম্ভব বলে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে ক্রমেই সরিয়ে নিয়ে আসেন। মনোবল আস্তে আস্তে কমে যায়। এক সময় নিজেকে গুটিয়ে নেন। আর যেসব প্রবীণ বিছানায় পড়ে আছেন, তাদের একাকিত্ব অকল্পনীয়। যেসব প্রবীণ চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না, তারা সামাজিক জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রবীণের সেবাযত্ন ব্যয়বহুল ও কষ্টকর। আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রবীণ যথাযথ সেবাযত্নের অভাবে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হন। সামাজিক যোগাযোগ একেবারেই কমে যায়। আত্মীয়-স্বজনও তেমন একটা খোঁজ-খবর নেন না।

সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ হলো মানসিক প্রতিবন্ধী প্রবীণ। শিশুকালে, যৌবনকালে মা-বাবা, ভাইবোনরা সেবাযত্ন, খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। একসময় মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি প্রবীণ বয়সে উপনীত হন। তখন মা-বাবা জীবিত থাকেন না। ভাই-বোন থাকলে তারাও প্রবীণ হন। আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে আত্মীয়-স্বজন সেবাদানকারী নিয়োগ দেন। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানসিক প্রতিবন্ধী প্রবীণ সীমাহীন দুর্ভোগ আর নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। প্রবীণ জীবনের শেষের দিনগুলো অর্থাৎ ৭০ বছরের পর থেকেই অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ আসতে শুরু করে। প্রথম আসে আর্থিক চ্যালেঞ্জ, এরপরই আসে নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতা থেকে প্রবীণ নারী-পুরুষ শারীরিক মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারো সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার সুযোগ নেই। তারা সুখ-দুঃখের কথা শুনতে চান না। তবে নানা অজুহাতে প্রায় সবাই তাদেরকে এড়িয়ে যান।

বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণে প্রবীণ ব্যক্তিরা কিছুটা বেশি কথা বলেন। এটাকে অনেকেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন না। তারা প্রবীণ প্যাঁচাল শুনতে বিরক্তবোধ করেন এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন। প্রবীণ জীবনের শেষ দিনগুলো অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক, সামাজিক, শারীরিক, মানসিক শক্তি অনেক বেশি দুর্বল থাকে। ফলে সংসারে-সমাজে তাদের প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে যায়।

বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য প্রবীণরা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলাধুলা, গল্প করা, সেবাযত্ন করা, অভিযোগ শোনা, দাবি-দাওয়া মেটানোর চেষ্টা করেন। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করেন। যাদের এ সুযোগ থাকে না তারা ধর্মীয় কাজ, সামাজিক কাজ করে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন। কখন সফল হন, কখনও বা নানা কারণে বিফল। তবে প্রবীণ বয়সে দু'টি বিষয়ে বেশি নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি হয়– একটি হলো স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হওয়া; আরেকটি হলো ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়া। ডিমেনশিয়া হলো স্মৃতিক্ষয়জনিত রোগ অর্থাৎ নিকট অতীতের অনেক কিছু ভুলে যাওয়া, যেমন চেনা পথ হারিয়ে ফেলা, নিকটজনদেরও নাম ভুলে যাওয়া, উদ্যম হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি। তাদের সঙ্গে সঙ্গ দিতে অনেকেই আগ্রহবোধ করেন না। তারা সামাজিক এবং পরিবারিকভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

প্রবীণ জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটাতে পারিবারিক উদ্যোগ থাকা জরুরি। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে সহানুভূতিশীল হতে হবে। সামাজিক উদ্যোগও উৎসাহিত করার প্রয়োজন রয়েছে। সবাইকে একটি কথা বুঝতে হবে যে, বেঁচে থাকলে প্রত্যেকেই প্রবীণ হবেন। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা কাটাতে ডে-কেয়ার সেন্টার, প্রবীণ ক্লাব, প্রবীণ হোটেল, বিনোদন ক্লাব তৈরি করা যেতে পারে।

এছাড়াও প্রবীণের কর্মদক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ, ঝগড়া-বিবাদ মেটানো, সম্পদের মালিকানা বণ্টন এবং বৈবাহিক সংকট নিরসনে প্রবীণরা দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তাদের জন্য এরকম সুযোগ তৈরি করলে সকলের জন্য তা সুফলজনক হবে। প্রবীণ যত বেশি কাজে কর্মে যুক্ত থাকবেন নিঃসঙ্গতা তত দূরে থাকবে।

শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের উপযোগী বিনোদন, অনুষ্ঠান, গান-বাজনা, ছায়াছবি তৈরি করতে হবে। এ বিশেষ ধরনের প্রবীণদের সঙ্গদানে পরিবারের সদস্য ও জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩

বৃদ্ধ বয়সে মা ও সন্তানের সম্পর্ক

মা ও সন্তানের সম্পর্ক প্রাকৃতিক। জন্মের পর মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে রেখে বড় করতে শুরু করে। একসময় কোল থেকে মাটিতে নামে শিশু। খেলার সাথী খুঁজে পায়। বইখাতা নিয়ে স্কুলে যায়। এভাবেই শিশু বড় হয় ও মায়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। যে শিশু মাকে না দেখে একদণ্ড থাকতে পারত না, সে শিশু একসময় মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে।

আমাদের সমাজব্যবস্থার কারণে সাধারণত নারী শিশুকালে বাবার তত্ত্বাবধানে, যৌবনে স্বামীর তত্ত্বাবধানে, বৃদ্ধকালে ছেলের তত্ত্বাবধানে থাকে। নারী স্বাধীনভাবে নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে না। নির্ভরতাই নারীর জীবনে বাস্তবতা হয়ে ওঠে। মা বুঝতে পারে তার কোন সন্তানটি সম্ভাবনাময়। তিনি মনের অজান্তে সেই সন্তানটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। তাকে একটু বেশি যত্ন-আত্তি করেন। অন্য সন্তানরা এটি বুঝতে পারে। তারা অভিযোগ করলে মা বলেন, 'আমার কাছে সবাই সমান, সবাই আমার সন্তান।' কিন্তু কেন মা তার বিশেষ এই সন্তানটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন? মা মনে করেন, বৃদ্ধ বয়সে যোগ্য সন্তানটি হয়ত তাকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দেবে। সেই যোগ্য সন্তানটির আশ্রয়ে-ছায়াতলে থাকতে পারার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পুষতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো এমনটি অনেক ক্ষেত্রে ঘটে না। দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে মা আশ্রয় ও সেবা পান সবচেয়ে দুর্বল সন্তানটির কাছ থেকেই।

যোগ্য সন্তানটি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ব্যস্ত জীবনে প্রবেশ করে। বেশিরভাগ সময়ই সাফল্য লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রথম দিকে মায়ের প্রতি খেয়াল থাকলেও আস্তে আস্তে তা কমতে থাকে। একসময় মায়ের প্রতি আর কোনো খেয়াল থাকে না। ঘর গোছানো, নাতি-নাতনি দেখাশোনা, রান্না-বান্নায় সহযোগিতা, বাসা পাহারা দেয়ার কাজ মা যতক্ষণ করতে পারেন, ততক্ষণ তবুও একটু গুরুত্ব থাকে। মা যখন এসব কাজ আর করতে পারেন না এবং নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়ে তার হাসপাতালে আসা-যাওয়া বেড়ে যায়, ঠিক তখনই সে সন্তানের আসল চেহারা প্রকাশ পায়।

যতদিন বাবা জীবিত থাকেন ততদিন মায়ের একটা ঘর অন্তত থাকে। বয়সের পার্থক্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রে মায়ের আগে বাবা মারা যান। মা গৃহহীন-আশ্রয়হীন হয়ে ছেলে-মেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান। আবার কেউবা স্বামীর ভিটামাটিতে পড়ে থাকেন। চরম অপমান, অবজ্ঞা আর অবহেলা নিয়ে দিনযাপন সত্যিই দুঃখজনক।

দেশে 'পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন-২০১৩' রয়েছে; কিন্তু বাবা-মা সন্তানের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে চান না। এখন পর্যন্ত মাত্র একটি মামলা হয়েছে চাঁদপুর জেলায়। আপনাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে সাবেক প্রধান বনসংরক্ষক ওসমান গনির কথা, যিনি এক এগারোর পট-পরিবর্তনের পর প্রায় পাঁচ কোটি টাকাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন। তার বাসার বিছানা, ফ্রিজ, আলমারি, চালের ড্রামে টাকা পাওয়া গেছে। তিনি প্রতি মাসে বৃদ্ধ মাকে ১ হাজার ৫০০ টাকা করে পাঠাতেন গ্রামের বাড়িতে। 'বনখেকো' ওসমান গনির মতো অনেক 'কুপুত্র' আমাদের সমাজে রয়েছে। নারায়ণগঞ্জে এক বৃদ্ধা মাকে ছেলেরা বাস স্টপেজে নামিয়ে দিয়ে সটকে পড়েছে। এমন বহু ঘটনা আমাদের আশ-পাশে ঘটে চলছে প্রতিনিয়ত। তেমন একটি সত্য ঘটনা আপনাদের জানাতে চাই।

ঘটনা : নাম মোমেনা খাতুন, বয়স ৭৩। তিন ছেলে এক মেয়ে। ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত। এক মেয়ে, সেও ভালো আছে। মোমেনার স্বামী মারা যান ১৯৭১ সালে। তখন তার বয়স ২৬ থেকে ২৭ বছর হবে। এ বয়সে আমাদের সমাজের মেয়েদের আবার বিয়ে হয়। মোমেনা ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিয়ে করেননি। ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করেছে। মোটামুটি ভালোই আছে। তিন ছেলের মধ্যে মেজো ছেলের প্রতি মোমেনার দুর্বলতা ছিল। ছেলেকে ডাকতেন 'কালো মানিক' বলে। তার এ ছেলে সত্যিই মানিক হয়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করেছে সে। শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রায় ২৫ বছর ধরে মোমেনা তার 'কালো মানিকের' কাছে থাকতেন। চার নাতি-নাতনিকে কোলেপিঠে করে বড় করেছেন। চারবার হজ করেছেন। দু'বার 'কালো মানিক' ছেলের সঙ্গে হজে গেছেন। দানখয়রাত করেছেন প্রচুর। পরিবারের সদস্য-আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীরা মোমেনার কাছ থেকে সাধ্য মতো সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন।

হঠাৎ করেই পরিস্থিতি পাল্টে গেল। 'কালো মানিক' মোমেনাকে জানাল, 'অনেক দিন আমার কাছে ছিলেন, এবার অন্য ছেলেদের কাছে থাকেন।' মোমেনা অভিমান করে গ্রামের বাড়িতে স্বামীর ভিটেতে উপস্থিত হলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন ছেলে হয়তো ফোন করবে ফিরে আসার জন্য। শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন হয়ে গেল, ছেলে আর ফোন করে না। তখন তিনি নিজেই শহরে ফিরে এলেন অন্য ছেলের বাসায়। এখানেও এক মাস হয়ে গেল ঐ ছেলের ফোন আসে না। শেষমেশ নিজেই ফোন করলেন ছেলেকে। আশা করেছিলেন ছেলে তাকে ফিরতে বলবে। ছেলে শুধু কথাবার্তা বলল, ফেরার কথা বলল না। মোমেনার চোখের পানি থামে না। পারিবারিক জটিলতা বেড়েই চলল। সব অপমান মাথায় করে মোমেনা আবার 'কালো মানিকের' বাড়িতে উঠলেন।

২৫ বছর ধরে যে বাড়িতে সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে থাকতেন, সেখানে এবার থাকতে শুরু করলেন সর্বনিম্ন সম্মান নিয়ে। অনেকটা বাড়ির বুয়ার মতো। মোমেনার অন্য ছেলে-মেয়েরা তাদের কাছে থাকতে বললেও তার ভালো লাগেনি। ২৫ বছরের অভ্যাস পাল্টাতে পারছেন না। অন্য কোথাও গেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভেবেছিলেন ছেলে 'কালো মানিকের' সুমতি হবে, কিন্তু হয়নি।

অতএব, সন্তান চেনার জন্য বৃদ্ধ বয়স হলো উপযুক্ত সময়। উপর্যুক্ত উদাহরণের ছেলের মত যেন কোনো মায়ের কোনো সন্তান না হয়। যখন নিজের কোনো কিছু করার ক্ষমতা থাকে না তখন মা সন্তানকে আগলে রেখে বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা সামর্থ্য অনুযায়ী ভালবাসা ও আদর-যত্ন দিয়ে করে থাকেন। সে সন্তান যেন প্রকৃত ভাল মানুষ হয়ে ওঠে এবং মায়ের বৃদ্ধ বয়সে সাধ্যমত তাদের সেবা-যত্ন করে সেটাই কাম্য।

৪

বৃদ্ধ বয়সে বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক

বৃদ্ধ বয়সই সন্তান চেনার উপযুক্ত সময়
-প্রবাধ

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো যেখানে সম্ভাবনা নেই, সেখানে বিনিয়োগ করে না। অর্থাৎ স্বার্থ না থাকলে আগ্রহ থাকবে না। স্বার্থ সাধারণত দুই ধরনের। বস্তুগত ও অবস্তুগত। বস্তুগত স্বার্থ হলো ধনসম্পদ, বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। অবস্তুগত স্বার্থ হলো যশ-খ্যাতি, সম্মান-মর্যাদা, আনুগত্য-সমর্থন, ক্ষমতা-দাপট ইত্যাদি। দেখা যায় মানুষ সাধারণত বস্তুগত ও অবস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাকুল। এ নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরণ নির্ধারণ করার দিকে অমনোযোগ থাকে।

বর্তমানে দেশের অধিকাংশ প্রবীণ আর্থিকভাবে দুর্বল। তারা যখন যৌবনে ছিলেন, তখন দেশের অর্থনীতি দুর্বল ছিল। আয়-রোজগার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। পরিবার-পরিজন, সন্তান লালন-পালনে উপার্জিত সব অর্থই ব্যয় করতে হতো। সঞ্চয় তেমন কিছুই থাকত না। নিজের ভবিষ্যৎ ছেলে-মেয়ের ওপর ছেড়ে দিতেন। মনে করতেন, কষ্ট করে ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছি। তারাই দেখবে। কিছু সংখ্যক মানুষের অবশ্য জমিজমা, বাড়িঘর, টাকা-পয়সা, দোকানপাট ছিল। তারা সাধারণত তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ-সুবিধা, সেবা-যত্ন পেয়ে থাকেন। যেসব ছেলে-মেয়ে বাবার চেয়ে অধিক সম্পদ-ক্ষমতার মালিক তাদের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সময় ভিন্ন ধরনের হয়। ধনী বাবা, মধ্যবিত্ত বাবা, নিম্নমধ্যবিত্ত বাবা, নিম্নবিত্ত বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ধনী প্রবীণরা বেশিরভাগ সময়ই একাই থাকেন। উচ্চশিক্ষা, চাকরি কিংবা ব্যবসার কারণে যেসব সন্তান দেশের বাইরে থাকেন তারা বাবার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন বেশি। কেউ কেউ বছরের একটা সময়ে এসে বাবার সঙ্গে সময় কাটিয়ে যান। দেশে থাকা সন্তানরা শহরের অন্য কোথায়ও থাকেন। বাবা নিজ বাড়িতে, সন্তান তার কর্মক্ষেত্র, নিজের বাড়ি, কিংবা ফ্ল্যাটে থাকেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে দেখা করতে আসেন সন্তান।

ক্ষেত্রবিশেষে প্রবীণ বাবা নিজের বাড়ি ত্যাগ করে সন্তানের সঙ্গে উঠতে আগ্রহী হতে চান না।

ধনী বাবার আলাদা একটা জগৎ তৈরি হয়ে আছে। তিনি স্বাধীন মর্যাদাপূর্ণ জীবন চান। সন্তানের ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকলে ধনী প্রবীণের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশংকা থাকে। যেসব ধনী প্রবীণের একাধিক সন্তান রয়েছে তারা কখনও বিশেষ কোনো একজন সন্তানকে সঙ্গে রাখেন। প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে বাবা তার সে সন্তানকে আমৃত্যু নিজের সঙ্গে রাখেন। ধনী বাবার সেবা-যত্ন, দেখাশোনা করার পর্যাপ্ত লোকবল থাকায় সন্তানের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটানোর আগ্রহ বেশি লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত প্রবীণ বাবার সন্তানরা মোটামুটি সামাজিক এবং আর্থিকভাবে ভালো থাকেন। তারাও মোটামুটি ধনী বাবার মতোই জীবন কাটান। দেখা যায় সন্তানের সঙ্গে নিজ বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে থাকেন বাবা। এমন বাবার সংখ্যা কম। মধ্যবিত্ত বাবার জীবনে তুলনামূলক বেশি ত্যাগ-তিতিক্ষার সংগ্রাম থাকে। ফলে সন্তানের সঙ্গে মনোমালিন্য একটু বেশি হয়। সহায়-সম্পদের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় তাকে বিচলিত করে তোলে। কোনো কোনো মধ্যবিত্ত প্রবীণ সংঘাতের আশঙ্কায় ইচ্ছা করে সন্তানের কাছ থেকে আলাদা থাকেন। নিয়ন্ত্রিত হতে চান না, এমন প্রবীণ বাবাকে আলাদা বাসায় কিংবা বাড়িতে থাকতে দেখা যায়।

নিম্নমধ্যবিত্ত বাবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থবিত্তহীন অবস্থায় দিনযাপন করেন। ভরণপোষণ ও চিকিৎসার খরচের জন্য সম্পূর্ণভাবে সন্তানের ওপর নির্ভরশীল থাকেন। কেউ কেউ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নেন। এ ক্ষেত্রে সন্তানের সঙ্গে মনোমালিন্য চোখে পড়ার মতো বিষয়। অনেক সময় বাবা চাইলেও সম্পদ হস্তান্তর, বিক্রি করতে পারেন না। কেউ কেউ পৈতৃক সহায়-সম্পদ হস্তান্তরে আগ্রহী হন না। সহায়-সম্পদ বিক্রি করলে টাকা-পয়সা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার সুযোগ পান না। একাধিক সন্তান থাকলে তাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রবীণ বাবার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। সব অভিযোগ, নালিশ, সালিশ, বিচার বাবার কাছে করা হয়।

নিম্নবিত্ত প্রবীণ বাবার সবচেয়ে দুরবস্থার মধ্যদিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। এরা পুরোপুরি সন্তাননির্ভর জীবনযাপন করেন। সামাজিক অনুদান, দয়া, করুণা, ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভর করে চলেন। সন্তান অর্থকষ্টে জীবন চালাতে হিমশিম

খায়। বাবার ভরণপোষণ, সেবা-যত্ন, চিকিৎসা চালানোর সামর্থ্য থাকে না। সরকারি অনুদান, সরকারি হাসপাতাল, মানুষের সহায়তা নিয়ে কোনোমতে জীবনকে টিকিয়ে রাখছে। সেবাযত্ন ও দেখাশোনার ক্ষেত্রে প্রায় সব বাবাই কোনো না কোনোভাবে অবহেলা-অযত্নের শিকার হন। ধনী বাবা-গরীব বাবা অনেকের একই হাল। শুধু অবহেলা-অযত্নের ধরন পাল্টে যায়। হাসিমুখে সন্তানের সাফল্য বর্ণনা করে বাবা সুখী হওয়ার ভান করেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রশংসা শুনে নিজেকে প্রবোধ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করতে পারলে বাবা ভালো থাকেন বেশি। বাবারা দুঃখ-কষ্টের কথা সাধারণত বলতে চান না; সন্তানকে ছোট করতে রাজি হন না। অনেক সময়ই বাবারা ছেলের বউ কিংবা মেয়ের জামাইয়ের কাছ থেকে অধিক সেবাযত্ন, সম্মান-মর্যাদা পান। প্রবীণ বাবাদের অসহায়ত্ত কাছে থাকা ছেলের বউকে বিচলিত করে তোলে। সব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে শ্বশুরের সেবা করেন। এমন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজে। তবে উল্টোটাও ঘটে অনেক।

বাবাতো বাবাই। ছেলে-মেয়েদের বড় করে তুলতে, প্রতিষ্ঠিত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। তাই প্রবীণ বাবাকে যথাসাধ্য সেবা-যত্নে করা, সম্মান দেয়া ছেলে-মেয়েদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রত্যেক সন্তানেরই উচিত প্রবীণ বাবা যাতে স্বস্তিতে থাকতে পারেন, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসা পেতে পারেন সেদিকে সাধ্যমত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সচেষ্ট থাকা।

৫

প্রবীণ প্রতিবন্ধী : একটি মানবিক চ্যালেঞ্জ

প্রতিবন্ধী বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অক্ষমতাকে। আমাদের দেশে কত প্রতিবন্ধী রয়েছে তার সঠিক হিসাব নেই। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৯/১০ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধী। সরকার প্রতিবন্ধীর সংখ্যা চূড়ান্ত করতে একটা জরিপ চালিয়েছে, তবে ফল জানা সম্ভব হয়নি। দেখা যাচ্ছে, দেশে প্রবীণ প্রতিবন্ধীর সংখ্যা নির্ণয় করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; কিন্তু সেই সংখ্যা জানাটা খুবই জরুরি।

প্রতিবন্ধী হন দু'ভাবে–জন্মগত অথবা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বা অসুখের কারণে। জন্মগতভাবে অন্ধ, বধির, খোঁড়া, অটিস্টিক হতে পারে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শরীরের অঙ্গহানি হতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য শরীরের কোনো অংশ ফেলে দিতে হয়। সে কারণে কাউকে প্রতিবন্ধী হতে হয়। মোটকথা যিনি কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে অপারগ, তিনি প্রতিবন্ধী হতে পারেন। যে শিশুটি প্রতিবন্ধী তাকে বাবা-মা যত্ন-আত্তি করে বড় করেন। অসুখ-বিসুখে সেবা-যত্ন করেন। তার চাহিদাগুলো বুঝতে পারেন। কিন্তু শিশুটি যখন প্রবীণ হবে, তখন তো তার বাবা-মা বেঁচে থাকবেন না। তার কী উপায় হবে? অবশ্য সরকার আশ্বস্ত করেছে, এ ধরনের শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের দেখভাল নিশ্চিত করা হবে। সরকার আশ্বস্ত করলেও বাবা-মার চোখে ঘুম নেই। অনাগত ভবিষ্যতের আশঙ্কা তাদের দিশেহারা করে তোলে। প্রতিবন্ধী সন্তানের শেষ জীবনটা কেমন হবে, এ ভাবনা থেকে তারা নিজকে মুক্ত করতে পারেন না। যাদের সহায়সম্পদ আছে, তারা সন্তানের জন্য ব্যাংক-ব্যালেন্স, বাড়ি রেখে যান। যাদের নেই, তারা অসহায় চোখে সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এসব শিশু একদিন প্রবীণ হবে। বার্ধক্য শরীরে বাসা বাঁধবে। সংকট আরও ঘনীভূত হবে। প্রতিবন্ধীদের কেউ কেউ বিয়ে করেন না। ফলে এদের পরিবার-সন্তান থাকে না। তাদের জন্য অপেক্ষা করে কষ্টকর ভবিষ্যৎ। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর ভবিষ্যৎ পরিবারের সদস্যদের দয়ার ওপর নির্ভর করে।

এবার আমরা আলোচনা করতে চাই প্রবীণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে। প্রবীণ বয়সে অনেকেই চোখের অসুখে ভোগেন। চোখে ছানি পড়ে কিংবা গ্লুকোমা হয়। ঠিক

সময়ে চিকিৎসা না নিলে অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। অনেকে আর্থিক সংকটের কারণে চিকিৎসা নিতে পারেন না। এতে অন্ধ হয়ে প্রবীণ জীবন কাটাতে হয়। স্ট্রোক করে শরীরের অর্ধেক অবশ হয়ে যায়। ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। দৈনন্দিন কাজকর্ম অন্যের সাহায্য ছাড়া করতে পারেন না। আবার কেউবা পড়ে গিয়ে হাত-পা-কোমর ভেঙে ফেলেন। চিকিৎসা শেষে অনেকেই ভালো হয়ে যান, কেউ কেউ হন না। দীর্ঘ চিকিৎসা ব্যয়বহুল এবং কষ্টদায়ক। যারা সুস্থ হতে পারেন না, তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন না।

প্রবীণদের কানে শোনার ক্ষমতা কমতে থাকে। কোনো কোনো প্রবীণ একেবারেই শুনতে পান না। তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সমাজের লোকজনের কাছে হাসি-ঠাট্টার পাত্র হন। এ প্রবীণরাই আবার শ্রবণ-প্রতিবন্ধী। ৬০ বছর অতিক্রম করলেই অনেকের স্মৃতিশক্তি আস্তে আস্তে কমে যায়। অতীতের অনেক বিষয় মনে করতে পারলেও বর্তমানের ঘটনা মনে রাখতে পারেন না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হন। ডিমেনশিয়া হলো সাধারণত প্রবীণ বয়সের স্মৃতিক্ষয়জনিত রোগ। তাদের আমরা মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কারণ, একটা সময় আর তারা নিজেদের কাজকর্ম করতে পারেন না; অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যেসব প্রবীণ বয়সের ভারে বাসা থেকে বের হতে পারছেন না কিংবা বিছানায় পড়ে আছেন, তারাও শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত হন।

প্রবীণ প্রতিবন্ধী আমি তাদেরই বলব, যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারেন না। যেমন গোসল করা, ভাত খাওয়া, ওষুধ খাওয়া, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, পায়খানা-প্রস্রাব করা ইত্যাদি। উপরের কাজগুলো করতে ব্যর্থ হয়ে তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। প্রবীণ প্রতিবন্ধী মানুষের চাহিদা পূরণ বর্তমান সময়ের একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

আমাদের সমাজে কর্মক্ষম প্রবীণই সাধারণত অবহেলা, অসম্মান এবং নির্যাতনের শিকার, সেখানে প্রবীণ প্রতিবন্ধী মর্যাদা ও সেবা পাবেন তা আরো কঠিন। এই অবস্থার কথা ভাবতে কষ্ট হয়। গল্প-কবিতা-নাটকসহ প্রায় সবক্ষেত্রে প্রবীণকে উপস্থাপন করা হয় খুবই দুর্বলভাবে। কখনো আবার হাস্যরস সৃষ্টি করতে প্রবীণ চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। প্রবীণকে যথাযথ মর্যাদা এবং সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয় না। আমরা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি কবিতা পড়েছি 'ক্রেব্‌ড এইজ অ্যান্ড ইয়ুথ'। এখানে কবি বার্ধক্যকে ঘৃণা করেন এবং যৌবনকে ভালোবাসেন।

আমাদের সব সাহিত্যকর্মে প্রবীণ চরিত্রটি চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবহেলা রয়েছে বলে আমি মনে করি। সব সাহিত্যকর্ম বলতে আমি যতটুকু পড়েছি, ঘরে-বাইরে প্রবীণরা একটা বিরক্তিকর বিষয়। সমাজ তাদেরকে অনেক সময় কটাক্ষ করে, গুরুত্ব দেয় না। সুযোগ পেলে ঠাট্টা-মশকরার নামে অপমান করে। অক্ষমতাকে আঙুল তুলে দেখায়। প্রবীণকে রাগিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষ মজা লোটে। অন্যদিকে শিক্ষিত মানুষ উপদেশ পরামর্শ দেয়ার নাম করে প্রবীণকে অপমান করে। শারীরিক অক্ষমতা প্রবীণকে সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অপেক্ষাকৃত তরুণরা প্রবীণদের শারীরিক এবং মানসিক বিষয় নিয়ে তেমন একটা ভাবে বলে মনে হয়নি।

সমাজকে প্রবীণ-বান্ধব, বিশেষ করে প্রবীণ প্রতিবন্ধী-বান্ধব করে গড়ার জন্য আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র এককভাবে সব প্রবীণের দায়ভার গ্রহণ করতে পারবে না। আর যদি সরকার তা নীতিগতভাবে গ্রহণ করেও, বাস্তবে তেমন কিছু ঘটবে না বলে মনে হয় এ দেশে। প্রতিবন্ধী প্রবীণকে সেবা দিতে হবে ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, মমতায়। প্রতিবন্ধী প্রবীণের সেবায় প্রথমে পরিবারের সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে। তারপর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে এগিয়ে আসতে হবে। কমিউনিটিতে প্রতিবন্ধী প্রবীণের সেবাযত্ন করার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, প্রবীণ নিবাস চালু করতে হবে সামাজিক উদ্যোগে, যেভাবে আমাদের সমাজে স্কুল-কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জনগণের ভালোবাসায় এবং আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো প্রবীণের স্বাস্থ্যসেবায় প্রধান ভূমিকা পালনের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ প্রবীণ প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধী প্রবীণ যদি আপনার প্রিয়জন হন নিশ্চয়ই তার জন্য আপনার কিছু করণীয় থাকবে।

আপনি এগিয়ে আসতে পারেন প্রবীণ সেবার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। এক্ষেত্রে অন্যদেরকে উৎসাহিত করতে পারেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ একদিন সামাজিক উদ্যোগে রূপান্তরিত হতে পারে।

যে সকল প্রবীণ প্রতিবন্ধী নন তাদেরকেও বিভিন্ন সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে যাতে তারা শেষ বয়সে স্বস্তির ও মানব-মর্যাদার জীবন যাপন করতে পারেন।

৬

প্রবীণের পুষ্টি সমস্যা এবং করণীয়

পুষ্টি সমস্যা মানে আমিষ, চর্বি, শর্করা, ভিটামিন এবং খনিজযুক্ত খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে না পারা। পরিমিত খাবার গ্রহণ করতে না পারলে অপুষ্টিতে ভুগতে হবে। অপুষ্টি যেকোনো বয়সের মানুষের জন্য মারাত্মক সমস্যা। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু অনেক ক্ষেত্রে খর্বাকৃতির এবং বুদ্ধিস্বল্পতার হয়ে থাকে। লেখাপড়ায় ভালো করতে পারে না। ধীরে ধীরে অসুস্থ হতে থাকে। প্রবীণ ব্যক্তি অপুষ্টিতে ভুগলে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবেন না। একপর্যায়ে মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়বেন। প্রবীণদের অপুষ্টি দূর করতে চাইলে এর কারণগুলো জানতে হবে। অপুষ্টির প্রধান কারণ হলো 'খাদ্য গ্রহণ' সংক্রান্ত জটিলতা।

কী এই জটিলতা

১. পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে না পারা, ২. খাদ্য তৈরি করার অক্ষমতা, ৩. পুষ্টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, ৪. খেতে মন চায় না, ৫. ফল ও শাক-সবজির অপ্রতুলতা, ৬. পানীয় জাতীয় খাবার না খাওয়া, ৭. তুলনামূলক নিম্নমানের খাবার গ্রহণ, ৮. খাবার হজম করার ক্ষমতা কম, ৯. দাঁতের সমস্যার কারণে খাবার চিবাতে পারে না, ১০. প্রায়ই একাকী খাবার খেতে হয়, তাই খেতে আগ্রহ কম হওয়া, ১১. পছন্দমতো খাবার না পাওয়া ইত্যাদি।

উপরের কারণগুলো খাদ্য গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে। এসব কারণেরও আবার কিছু কারণ রয়েছে। যেমন– টিকে থাকার সামর্থ্য। প্রবীণ ব্যক্তির যথেষ্ট শক্তি নেই, খাইয়ে দিতে হয়, হাত-পা নাড়াতে পারেন না কিংবা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন না। তারা অপুষ্টির ঝুঁকির মধ্যে পড়েন। পারিবারিক জীবন খাদ্য গ্রহণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। একাকিত্ব, সেবাযত্ন করার লোকের অভাব, সন্তানদের সঙ্গে দূরত্ব, নাতি-নাতনিদের দেখাশোনার দায়িত্ব এসব কারণেও অনেক সময় ঠিকমতো খাবার গ্রহণ করতে পারেন না। শারীরিক অক্ষমতা, যেমন– সূর্যের আলোয় যেতে না পারা, চলাফেরায় দুর্বলতা, চোখের

সমস্যা, ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, ঘর থেকে বাইরে বেরোতে না পারা, এসব কারণে খাদ্য গ্রহণের ওপর প্রভাব পড়ে। দারিদ্র্য, যেমন– কম আয়, খাদ্য উৎপাদনের জন্য কম জমি, সংসারের খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে খাদ্য গ্রহণে সংকট তৈরি হয়। স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন– দীর্ঘ রোগভোগ, ওষুধের ব্যবহার, তামাক, ধূমপান, মদপানের কারণে, পুষ্টিগত সমস্যা তৈরি হতে পারে। মানসিক সংকট বা আবেগজনিত কারণে, যেমন– প্রিয়জনের মৃত্যু, ডিমেনশিয়া, বিষণ্নতা, একাকিত্ব, নতুন পরিবেশ খাদ্য গ্রহণের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। যেসব প্রবীণ অন্যের সাহায্য ছাড়া খেতে পারেন না অথবা তাদেরকে খাইয়ে দিতে হয়, তাদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে সেবাদানকারীর পুষ্টিজ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আমরা এখনও সামাজিক প্রথা, অন্যের পরামর্শে কিংবা নিজ ইচ্ছামাফিক নির্ভরশীল প্রবীণদের খাদ্য সরবরাহ করে থাকি। সামর্থ্য থাকলে প্রবীণদের ভালোমন্দ খাবার খেতে দিতে গিয়ে উচ্চমাত্রার আমিষ জাতীয় খাদ্য, যেমন– মাংস, মাছ, কলিজা, দুধ বেশি করে দেই। অথবা ক্ষতি করবে এমন ভাবনা থেকে এসব খাদ্য প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয়। আর সামর্থ্য কম হলে প্রবীণদের অবহেলা করা হয়। পারিবারিক সংকটের সময় প্রবীণরা ঠিকমতো খেতে চান না অথবা পান না। খাবার টেবিলে একা বসে থাকা কষ্টের। কখনো প্রবীণরা মানসিক চাপের কারণে অল্প খাবার গ্রহণ করেন কিংবা কাউকে দিয়ে দেন। মানসিক সংকট, যেমন–ডিমেনশিয়া আক্রান্ত প্রবীণ জানেন না তিনি খেয়েছিলেন কিনা। তিনি হয়তো বেশি খাবার গ্রহণ করেন অথবা খাবার গ্রহণ করতে চান না। কখনো মনে করেন তিনি খাবার খাননি, খাবার দেওয়ার জন্য বলেন। আবার হয়তো খাননি, বলেন খেয়েছেন।

পরিবারে নিকটতম প্রিয়জনের মৃত্যুতে প্রবীণরা খাবার গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন অথবা অনিয়মিত খাবার গ্রহণ করে অপুষ্টির শিকার হন। ঘ্রাণশক্তি কমে যাওয়ায় খাদ্যের ঘ্রাণ খাবার গ্রহণে আগ্রহী করে না। শারীরিক অক্ষমতায় পছন্দসই খাবার তৈরি করতে পারেন না। অন্যের তৈরি খাবার পছন্দ হয় না। খাবার পরিবেশনায় অবহেলার ছাপ থাকলে কোনো কোনো প্রবীণ খাবার গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। প্রবীণ নির্যাতনের শিকার হলে অভিমানে-ক্ষোভে-দুঃখে খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন অথবা খুব সামান্য পরিমাণে খাবার গ্রহণ করেন। অপছন্দের ব্যক্তি খাবার পরিবেশন করলে প্রবীণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খাবার চিবানোর চেয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করেন কিংবা খুবই কম খাবার

গ্রহণ করেন। দরিদ্র প্রবীণ আর্থিক সংকটের কারণে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারেন না। অনেক সময় ধনী প্রবীণ আর্থিক সংকট না থাকলেও পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হন পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে। গ্রামে জমিজমার মালিক কিন্তু পুষ্টিকর খাবার পান না। কেননা পুষ্টি সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই বা পরিবার থেকে তার প্রতি নজর দেয়া হয় না। জমিজমা নেই, কিন্তু শহরে থাকেন এবং সঙ্গতি আছে এমন প্রবীণ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন। তবে ধনী হলেই পুষ্টিকর খাবার পাবেন– এমনটা সত্যি না-ও হতে পারে। পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে অথবা পারিবারিক অবহেলার কারণে সেরকমটি ঘটতে পারে।

অনেক প্রবীণ একাকী থাকেন; কিন্তু পুষ্টিকর খাবার খান। একাকী নিঃসঙ্গ থাকলেই পুষ্টিহীনতার শিকার হবেন, এমন কোনো কথা নেই। তবে নিঃসঙ্গ একাকী প্রবীণ অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকেন। স্বামী কিংবা স্ত্রীর মৃত্যু হলে প্রবীণ ব্যক্তির অপুষ্টির শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ তীব্র হলে সবাই একত্রে খাবার গ্রহণের সুযোগ কমে যায়। এ কারণে প্রবীণ পুষ্টি ঝুঁকিতে পড়েন। প্রবীণ সবার সঙ্গে খাবার গ্রহণে ইচ্ছুক। পরিবারের সব সদস্যের সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রবীণ আনন্দের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করেন।

একজন প্রবীণ দৈনিক কয়বার খাদ্য গ্রহণ করবেন– এ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে মানুষ তিনবার প্রধান খাবার খায়। সকালে নাশতা, দুপুরে ভাত, রাতে রুটি বা ভাত সঙ্গে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল সবজি ইত্যাদি থাকে। প্রধান খাবারের বিরতিতে হালকা ধরনের নাশতা, ফলমূল গ্রহণ প্রবীণের পুষ্টি জোগাতে সহায়তা করবে। অর্থাৎ প্রবীণ পরিমাণে অল্প কিন্তু ঘন ঘন খাবার গ্রহণ করলে পুষ্টি জোগানের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থায় থাকেন। যদি প্রতিদিনই ভাত, রুটি, সবজি, ডাল, মাছ, চা খান তবুও প্রবীণ ব্যক্তিটির ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতি দেখা দেবে কেননা প্রাত্যহিক খাবারে রুটি, ভাত, চিড়ামুড়ি, আলু, ভুট্টা, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা, দই, পনির, তেল, মাখন, ডাল, মটর, বাদাম ইত্যাদির মধ্য থেকে সুষম খাদ্য খেতে হবে।

প্রবীণদের খাবার উন্নত করার জন্য নিচের কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। শাক-সবজি অতিরিক্ত রান্না না করা, সহজপাচ্য খাবার তৈরি, সহজে প্রস্তুত করা যায় এমন খাবার, ফলের রস, সুপ, দই ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে।

প্রবীণরা কোন ধরনের খাবার গ্রহণে সতর্ক হবেন?

চা-কফি, কম খেতে হবে। এসব পানীয় দেহে পুষ্টি গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে, ধূমপায়ী হলে ধূমপান বন্ধ করতে হবে। ধূমপান হজমশক্তি নষ্ট করে, নানান অসুখ হয় তারমধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। চিনি-লবণ গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। এ দু'টি জিনিস প্রবীণের জীবনে ঝুঁকি বাড়ায়। মদপান প্রবীণের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রবীণের শারীরিক সামর্থ্য বাড়ানোর গুরুত্ব অনেক বেশি। খাদ্য প্রস্তুত এবং খাবার গ্রহণের জন্য শারীরিক সামর্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালো খাবার শরীরে পুষ্টি জোগায়। এতে একজন প্রবীণ শারীরিক সামর্থ্য পান। শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান প্রবীণ স্বাধীন এবং উন্নততর জীবনযাপনে সক্ষম হন। প্রতিদিন হাল্কা ব্যায়াম করা, রোদে কিছুক্ষণ থাকা, যোগ ব্যায়াম করা ইত্যাদি মেনে চললে শরীরে ফিটনেস এবং হজমশক্তি বাড়বে। খাদ্য ঘাটতি নিরসনে বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে প্রবীণরা নিজেদের খাবার ছেলে-মেয়ে অথবা নাতি-নাতনিদের জন্য রেখে দেন। এতে প্রবীণ পুষ্টিহীনতার শিকার হতে পারেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নানা ধরনের সামাজিক আয়োজন বিষণ্নতা, হতাশা কাটাতে সহায়তা করবে। প্রবীণদের জন্য প্রবীণ ক্লাব, প্রবীণ ডে-কেয়ার সেন্টার, প্রবীণ আড্ডা, প্রবীণ মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়ানো যাবে। যেসব প্রবীণ একাকী জীবনযাপন করছেন কিংবা ঘর থেকে তেমন একটা বের হতে পারেন না, তাদের নিয়মিত খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করতে হবে। ঘরে আটকে থাকা প্রবীণদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ বাড়লে অপুষ্টিজনিত ঝুঁকি কমে আসবে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রবীণের পুষ্টি নিয়ে তেমন কেউ এগিয়ে আসছে বলে আমি জানি না। কিন্তু প্রবীণ জীবনে পুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে নজর দেয়া জরুরি। পুষ্টিবিদদের পরামর্শ নিয়ে সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে দেশের সর্বত্র (গ্রাম, শহর) সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে এগিয়ে আসা জরুরি। যুব সমাজ এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে– এককভাবে হয়ত নিজ নিজ পরিবার পর্যায়ে এবং সঙ্গবদ্ধভাবে স্থানীয় এলাকায়। গ্রামীণ পর্যায়ে এমন উদ্যোগের যেমন ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি সুযোগ সৃষ্টি করাও সম্ভব। প্রয়োজন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনা, আগ্রহ এবং এগিয়ে আসার মানসিকতা।

৭
বাস-ট্রেন-লঞ্চে প্রবীণের চলাচলে বিড়ম্বনা

গণপরিবহনে চলাচল সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে ঢাকা শহরে গণপরিবহণে চলাচল ছিল কষ্টকর। এখন সারা দেশেই একই অবস্থা। ঢাকা শহরের ভেতর এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে অনেক সময় লেগে যায়। যানজট তীব্র হলে সময় আরও বেশি লাগে। শুধু রাস্তায় আমাদের লাখ লাখ শ্রমঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়। যারা প্রতিদিন কর্মক্ষেত্রে বাস-টেম্পোয় আসা-যাওয়া করেন, কষ্টের কথা তারা বেশি বলতে পারবেন।

যারা নানা কাজে ঢাকা শহরে আসেন তারা গণপরিবহনে চলাচল কতটা কষ্টকর, তা উপলব্ধি করতে পারেন। তীব্র যানজট এবং ওঠানামার বিড়ম্বনা প্রবীণদের জন্য আরো পীড়াদায়ক। বিশেষ প্রয়োজনে প্রবীণরা বাসে চলাচল করতে চাইলে বেশ কয়েকটি ঝামেলা পোহাতে হয়। প্রথমত, বাসে ওঠার সমস্যা। বাস স্টপেজে যাত্রীর ভিড় থাকে। ভিড় মোকাবিলা করে সহজে বাসে উঠতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, সিটের সমস্যা। লড়াই করে বাসে উঠতে পারলেও বসার সিট পাওয়া স্বপ্ন। ভাগ্য ভালো হলে কেউ কেউ বসার সুযোগ পান। অন্যথায় দাঁড়িয়ে যেতে হয়। দাঁড়িয়ে আসা-যাওয়া ভীষণ কষ্টের। বেশিরভাগ প্রবীণের হাঁটু, কোমর, পিঠ, হাতে ব্যথা থাকে। এ ধরনের প্রবীণদের বাসে দাঁড়িয়ে চলাফেরা খুবই কষ্টের। অনেক বাসে দাঁড়িয়ে চলাচলের সময় ধরে দাঁড়ানোর সহজ কিছু থাকে না। ব্রেক কষলে নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, বাস থেকে নামার যন্ত্রণা। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছলে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামা খুবই বিপজ্জনক। কন্ডাক্টর বলতে থাকবেন, আগে বাঁ পা দেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নামতে হয়। দ্রুতগতিতে বাস থেকে নামতে গিয়ে অনেক সময় প্রবীণরা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না। চতুর্থত, প্রচণ্ড গরমে বাসের মধ্যে সিদ্ধ হতে হয়। বেশিরভাগ বাসে ফ্যান থাকে না। যে কয়েকটিতে থাকে তা আবার নষ্ট। পঞ্চমত, যাত্রীছাউনি না থাকা। মানুষ বাসে ওঠেন রাস্তা থেকে, নামেনও রাস্তার ওপর।

ঝড়-বৃষ্টিতে প্রবীণরা বাসে উঠতে-নামতে পারেন না। যারা উঠতে-নামতে বাধ্য হন তারা ভিজে যান। ঝড়-বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ কোথাও একটু আশ্রয় পাওয়ার

জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ান। এ পরিস্থিতিতে প্রবীণদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়ে। যাত্রী-ছাউনি না থাকায় ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট আরও বাড়ে। উপায়হীন প্রবীণরা বাসে চলাচল করেন। যাদের সামর্থ্য আছে তারা সিএনজিচালিত অটোরিকশা, রিকশায় যাতায়াত করতে পারেন। তবে সিএনজিচালিত অটোরিকশা কিংবা রিকশায় চলাচল করা প্রবীণদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। কারণ, রিকশায় চলাচল করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ার আশংকা থাকে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা প্রবীণের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। বেশি ভাড়া দাবি করে। কাঙ্ক্ষিত স্থানে যেতে অস্বীকার করে ইত্যাদি।

মারাত্মক শব্দদূষণে সাধারণ মানুষের জীবন বেহাল। আর প্রবীণরা মারাত্মক হাইড্রোলিক হর্ন শুনে আঁতকে ওঠেন। উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত প্রবীণ ব্যক্তিরা শব্দদূষণের কবলে পড়ে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রবীণদের টয়লেট ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। বাসস্টপেজগুলোয় টয়লেট নেই। যেসব জায়গায় টয়লেট আছে, সেখানে ঢোকা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাসের চেয়ে ট্রেনে চলাচল করা প্রবীণদের জন্য অধিক সুবিধাজনক। কাছাকাছি দূরত্বে যেতে প্রবীণদের মধ্যে ট্রেনে ভ্রমণ অধিক জনপ্রিয়। কারণ, ভাড়া তুলনামূলক কম। দাঁড়িয়ে যেতে হয় না। বেশিরভাগ সময় সিট পাওয়া যায়। আন্তঃনগর ট্রেনে সিট পাওয়া যায়। টয়লেট সুবিধা রয়েছে। ঝাঁকুনি তেমন একটা হয় না। যানজটের কবলে পড়তে হয় না। ট্রেনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ওঠানামা। প্লাটফর্ম থেকে গাড়িটি একটু উঁচু থাকে। প্রবীণদের মধ্যে হাঁটু-কোমরে ব্যথা থাকায় ট্রেনের কামরায় ওঠতে সমস্যা হয়। কমলাপুর স্টেশনে রাজশাহী-ঢাকার আন্তঃনগর ট্রেনগুলো ব্রডগেজ লাইনে চলে। ব্রডগেজে চলা ট্রেন কমলাপুর স্টেশনে এলে তা প্লাটফর্ম থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। শারীরিভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের এ ধরনের ট্রেনের কামরায় ওঠা বিপজ্জনক, আর প্রবীণদের জন্য এটি মহাবিপজ্জনক। তাপানুকূল শ্রেণিতে ভ্রমণকারী বিশেষ ব্যক্তিদের কামরায় ওঠার জন্য কাঠের বিশেষ সিঁড়ি রয়েছে। মিটারগেজ ট্রেনলাইনের স্টেশনে ব্রডগেজ লাইনে চলাচলকারী ট্রেনের কামরা প্লাটফর্ম থেকে তুলনামূলক বেশি উঁচুতে থাকায় প্রবীণ এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওঠানামা সত্যিই অনেক কষ্টের। এ সমস্যা সমাধানে তেমন কোনো অর্থ খরচ হবে না। কতকগুলো কাঠের সিঁড়ি বানিয়ে ট্রেনের কামরার দরজায় ওঠানামার সময় লাগিয়ে দিলেই হলো।

রেলস্টেশনে তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রীসাধারণের জন্য টয়লেট সুবিধা নেই বললেই চলে। কমলাপুর স্টেশনে আমি প্রথম শ্রেণি তাপানুকূল বিশ্রামাগারে টয়লেট সুবিধা দেখি। স্টেশনের পাশে একটি পাবলিক টয়লেট রয়েছে। সেখানে টাকার বিনিময়ে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। স্টেশনের ভেতরে অবস্থানকারী যাত্রীরা অনেকেই জানেন না কোথায় শৌচাগার রয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তির প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে যতটা সম্ভব কাছাকাছি জায়গায় শৌচাগার নির্মাণ করা যেতে পারে।

দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য অধিকাংশ মানুষই লঞ্চ-স্টিমারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। প্রবীণরা নৌপথে যাতায়াত করতে বেশি আগ্রহী। লঞ্চের ভেতর চলাচল করা যায়। বসার ব্যবস্থা সন্তোষজনক। আরামদায়ক কেবিন রয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি রয়েছে। খাবার গ্রহণের সুযোগ থাকে। পর্যাপ্ত শৌচাগার আছে। কম ভাড়ায় যাতায়াতকারী প্রবীণরা বিছানা পেতে শুয়ে-বসে যেতে পারেন। লঞ্চে চলাচল করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, লঞ্চে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা। সদরঘাট টার্মিনালে প্রচণ্ড ভিড়ে যাত্রীরা সিঁড়ি দিয়ে লঞ্চে ওঠেন। সিঁড়ির দু'পাশে কোনো রেলিং থাকে না। আগের দিনের স্টিমারগুলোয় রেলিং ব্যবস্থা ছিল। সিঁড়িগুলো তেমন প্রশস্ত নয়। কাঠের সিঁড়ির মাঝখানে অনেক বাটন দেয়া থাকে। ফলে ওঠা-নামায় সতর্ক হতে হয়। যেসব স্টেশনে পন্টুন থাকে না সেখানে নদীর পাড়ে নিচু করে সিঁড়ি দেয়া হয়। এসব সিঁড়ি দিয়ে প্রবীণের ওঠা-নামা অত্যন্ত কষ্টের। মাঝেমধ্যে দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসা লঞ্চ সদরঘাট টার্মিনালে ভিড়তে পারে না। অন্য একটি লঞ্চের পেছনে ভেড়ে। যাত্রীরা এক লঞ্চ থেকে আরেক লঞ্চে উঠে তারপর টার্মিনালে আসতে পারেন। এক লঞ্চ থেকে আরেক লঞ্চে যাওয়া অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিন হলে কষ্টের মাত্রা খানিকটা বাড়ে।

সদরঘাটে প্রচণ্ড যানজট থাকায় প্রবীণরা গন্তব্যে পৌঁছতে কাহিল হয়ে পড়েন। দক্ষিণাঞ্চলে চলাচলকারী নৌযানগুলো দোতলা-তিনতলা বিশিষ্ট হয়। অনেক প্রবীণের হাঁটু-কোমরে ব্যথা থাকায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারেন না। ফলে লঞ্চে দোতলা-তিনতলায় আরামদায়ক কেবিন এবং প্রথম শ্রেণির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। গণপরিবহনে চলাচলের জন্য প্রবীণদের প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে হবে। একই মনোভাব দেখাতে হবে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীদের প্রতি। মোটকথা, সব বয়সি মানুষের জন্য গণপরিবহন নিরাপদ এবং আনন্দদায়ক

হোক– এটাই আমরা চাই। বাসে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ৯টি সিট সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি প্রবীণের কথা ভেবে বিশেষ করে অতিপ্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বাসে সিট সংরক্ষণ করা এখন সময়ের দাবি।

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রবীণ ব্যক্তিরা বিভিন্ন স্থানে যেতে আগ্রহী। বেশিরভাগ প্রবীণেরই পারিবারিক দায় থাকে না। তারা অনেকটা স্বাধীন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে চান। শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে যেতে আগ্রহী। দর্শনীয় স্থান কিংবা ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনে আকুলতা থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চান। গণপরিবহনে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বল্প ভাড়ায় চলাচল করতে পারলে প্রবীণরা ভ্রমণে আগ্রহী হবেন। এতে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভালো থাকবেন। প্রবীণ ভালো থাকলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারলে সবার জন্য ভালো। চলাফেরার ঝক্কি-ঝামেলা বেশি হলে প্রবীণরা ঘর থেকে বের হতে আগ্রহী হবেন না। ফলে প্রবীণ জীবন নিঃসঙ্গ-আনন্দহীন একঘেয়ে হয়ে পড়বে। পরিবারে আটকে পড়া প্রবীণের অসুস্থ হওয়ার আশংকা বেশি। অসুস্থ প্রবীণ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। পরিবারের সদস্যরা প্রবীণ ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

উল্লিখিত অনেক সমস্যা সহজে সমাধান করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো সচেতনভাবে কাজ করলে তা অবশ্যই করতে পারেন। তরুণ প্রজন্ম এ সকল বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রবীণদের পক্ষে দাবি উত্থাপন করতে পারে, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

৮

আলঝেইমার রোগ এবং করণীয়

আলঝেইমার হলো মস্তিষ্কের একধরনের রোগ। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি স্মৃতিশক্তি, মেধা, বিচার ক্ষমতা, যুক্তিসংগত আবেগ, সামাজিক দক্ষতা হারাতে থাকেন। এ রোগটি আবিষ্কার করেন জার্মান মানসিক রোগের চিকিৎসক আলঝেইমার। তার নামানুসারে রোগটির নাম আলঝেইমার রাখা হয়েছে। আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের কোষগুলো সংকুচিত হতে থাকে, জট লাগে, ফলক বা অনাকাঙ্ক্ষিত স্তর পড়ে। মস্তিষ্কের যে অংশ আক্রান্ত হবে, রোগের লক্ষণ সেভাবেই প্রকাশ পাবে।

এ রোগ কাদের হয়? সব বয়সি মানুষের এ রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে ৬৫ বছরের অধিক বয়সি মানুষের মধ্যে আলঝেইমার রোগটি বেশি দেখা যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় চার কোটি লোক আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগামী ২০ বছরে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। আমেরিকায় ৫০ লাখ, ব্রিটেনে ৫ লাখ ২০ হাজার, অস্ট্রেলিয়ায় ৩ লাখ ৫৩ হাজার ৮০০ জন বর্তমানে আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত। আমেরিকায় প্রতি ৬৬ সেকেন্ডে একজন আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আমেরিকায় প্রতি তিনজন প্রবীণের মধ্যে একজন এ রোগে আক্রান্ত। আক্রান্ত ব্যক্তিদের তিনজনের মধ্যে দু'জনই আবার নারী। আমেরিকায় মানুষের মৃত্যুর প্রধান ১০টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে আলঝেইমার রোগটি। ২০১৬ সালে আমেরিকায় আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা দেয়া হয় ১৮.২ বিলিয়ন ঘণ্টা। এতে খরচ পড়ে ২৩০ বিলিয়ন ডলার। ২০১৭ সালের খরচ ধরা হয়েছে ২৫৯ বিলিয়ন ডলার। আর ২০৫০ সালের খরচ হবে ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার।

অস্ট্রেলিয়ায় আলঝেইমার রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। হৃদরোগসহ অন্যান্য অসংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে পারলেও আলঝেইমার রোগে মৃত্যুর হার কমেনি, বরং বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ২০০৫ সালে ৪ হাজার ৬৫৩ জন, ২০০৯ সালে ৮ হাজার ২৮০ জন, ২০১৪ সালে ১১ হাজার ৯৬৫ জন এরোগে মৃত্যুবরণ করেন। অস্ট্রেলিয়ায় তৃতীয় মৃত্যুর কারণ আলঝেইমার।

পুরুষের তুলনায় নারীর মৃত্যুর হার প্রায় দ্বিগুণ। উন্নত দেশগুলো আলঝেইমার রোগটি সম্পর্কে গবেষণা অব্যাহত রাখছে। আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনমান বজায় রাখতে কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। অনিরাময়যোগ্য এ রোগটি একজন মানুষের ব্যক্তিজীবন অসংগঠিত করে দেয়। পাশাপাশি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ওপর আর্থিক এবং নৈতিক দায় সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে আলঝেইমার রোগটি সম্পর্কে ধারণা পেতে স্যার উইলিয়াম বেভারিজ ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঢাকা শহরের ধানমন্ডি ও কলাবাগান থানার আওতায় ৩৭৪ জন প্রবীণ নর-নারীর আলঝেইমার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এই তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২৬ জন নারী-পুরুষের মধ্যে আলঝেইমার রোগের লক্ষণ রয়েছে। ফাউন্ডেশনের এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ফাউন্ডেশন পরে এজিং সাপোর্ট ফোরামের সহায়তায় ঢাকার ধামরাই উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নে ১ হাজার ২০০ জন প্রবীণের তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১০ জন প্রবীণ আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত। এটি নিশ্চিত করার জন্য একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞকে রোগীর বাড়িতে আনা হয়। তার নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক মাত্র দু'জনকে আলঝেইমার আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করেন। আমার জানামতে এ দু'টি জরিপ হয়েছিল। বাংলাদেশে কত মানুষ আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত তা কেউ বলতে পারবে না; বড়জোর একটা ধারণা দিতে পারবে। মনগড়া ধারণা নিয়ে আলঝেইমার আক্রান্ত মানুষের জন্য কোনো পরিকল্পনা দাঁড় করানো অনেক কঠিন।

আলঝেইমার রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া; পরিচিত স্থান, পরিচিতজনকে চিনতে না পারা কিংবা ভুলে যাওয়া, সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলা, দিন-তারিখ মনে করতে না পারা; যুক্তিসংগত আচরণ করতে না পারা ও টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে না পারা; সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠা ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন, দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে না পারা, নিজেকে গুটিয়ে আনা– এসব লক্ষণও আলঝেইমার আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। তবে একেকজন লোকের মধ্যে একেক ধরনের লক্ষণ বেশি দেখা দেয়। সবারই একই রকমের লক্ষণ দেখা যায় না। রোগের বিভিন্ন পর্যায় থাকে। সবাই সব পর্যায় অতিক্রম

করতে না-ও পারে। আলঝেইমার রোগের লক্ষণ নিয়ে পাঠকদের কাছে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে চেষ্টা করছি।

প্রথম পর্যায়, এ রোগের সূত্রপাত হয় খুবই ধীরগতিতে। প্রায়ই অনেকেই প্রথম দিকে বুঝতে পারেন না যে তার এ রোগ শুরু হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি একটু বেশি উদাসীন হয়ে পড়েন, কোনো কিছুতেই আগ্রহবোধ করেন না, ব্যক্তির মাঝে কোনো আনন্দ লক্ষ্য করা যায় না। মেজাজটা প্রায় বিগড়ে যায়, খুব বেশি খিটখিটে হয় পড়েন। একটুতে হতাশ হয়ে পড়েন। নিজকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, একই কথা বারবার বলেন। চিন্তা-ভাবনা দ্রুত করতে পারেন না। প্রতিদিনের কাজকর্ম শেষ করতে বিলম্ব হয়। বর্তমান ঘটনা মনে রাখতে পারেন না; কিন্তু পুরোনো ঘটনা স্পষ্ট মনে করতে পারেন। টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে পারেন না। টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র হারিয়ে অন্যদের দোষ দিয়ে থাকেন। ওষুধপথ্য নিয়মমতো খেতে ভুলে যান। নামাজ পড়েছেন কি-না বলতে পারেন না। শখের জিনিসপত্রের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন না; এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা পরিবার-পরিজনকে অসন্তুষ্ট করে। মন্দ সিদ্ধান্ত নেন, ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়েন। মাঝামাঝি পর্যায়ে রোগীর কিছু কিছু সক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে, তবে বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। রোগীর সেন্স যেমন–স্পর্শ, শোনার ক্ষমতা, স্নেহের দৃষ্টি, হাসিমুখ এসব আবেগে সাড়া দেয়া অক্ষুণ্ন থাকে ঠিকই। সময় এবং স্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। পরিবারের সদস্যদের এবং বন্ধুদের নাম মনে করতে না পারা। আপনজনদের চিনতে না পারা। নিজের ঘর চিনতে না পারা। অতীতের কথা মনে করতে পারলেও বর্তমান ঘটনা মনে করতে পারেন না। রাতের বেলা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া। হাত না ধুয়ে খেতে বসা, খাবার খেতে খেতে হঠাৎ করে খাবার রেখে উঠে যাওয়া। রাতে লাইট না জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে হাঁটতে থাকা। ঘরের কাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘরের বাইরে চলে যাওয়া। এ পর্যায়ে রোগী কখনও বলে, তাকে কেউ মেরে ফেলতে চায়, তার কাছে জিন এসেছিল। নিজে অনেক বড় ওলী কিংবা তার আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। রোগী মনে করেন, তিনি অনেক বড় যোগ্য নেতা। সবাই তার ক্ষতি চায়। রাতে জ্বিন-ভূত এসে তাকে বিভিন্ন হুমকি দেয় বলে জানান।

অপরিচ্ছন্ন থাকা, গোসল করতে না চাওয়া, ময়লা কাপড়চোপড় পরা, হতাশা প্রকাশ করা ইত্যাদি। এরা খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে মাঝে মধ্যে সহিংস আচরণ করেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগী নিজে নিজের যত্ন করতে পারেন না। নিজের মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী কাউকে চিনতে পারেন না। কারো কথাবার্তা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। গোসল করা, টয়লেট করা, কাপড় পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কারো সাহায্য ছাড়া করতে পারেন না। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চিনতে পারেন না। রাতে নানারকম সমস্যা তৈরি করেন। আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠা, অসংযত হয়ে পড়া। খাবার গ্রহণ করার পরপরই তা ভুলে যান এবং খাবার খেতে চান। হাঁটাচলা করতে পারেন না। এ সময় রোগীর সংক্রমণ, জ্বর, ব্যথাবেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, পুষ্টিহীনতা, ডিহাইড্রেশন ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

এ রোগের চিকিৎসা কী? সত্যিকার অর্থে এ রোগের কোনো চিকিৎসা বা ওষুধ নেই। এখন পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ রোগের ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেননি। বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি নানারকম প্রচারণা চালায়, যাতে মনে হয় অতি তাড়াতাড়ি এ রোগের ওষুধ আবিষ্কার করা হয়ে যাবে। অনেক সময়ই রোগীর আত্মীয়-স্বজন নানা ধরনের প্রতারণার শিকার হন। আলঝেইমার রোগীকে কীভাবে সেবা দেয়া যাবে? পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এ রোগীর সেবা করবেন। সেবা প্রদান কঠিন, ক্লান্তিময়, বিরক্তিকর হতে পারে।

তাই সেবাদানকারী ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল-সহনশীল-সংবেদনশীল ও কৌশলী হতে হবে। আলঝেইমারে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দরকার সযত্ন সেবা, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। সেবাযত্নের জন্য দরকার সার্বক্ষণিক সাহায্যকারী, পছন্দের কাজ করতে দেয়া, পছন্দের গান শোনানো। ব্যায়াম করানো, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেয়া, পছন্দের খেলাধুলা করতে দেয়া। আপনজনদের সঙ্গ বেশি পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া। পছন্দের জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। প্রিয় লেখকের বই পড়ে শোনানো। শখের কাজ করতে দেয়া– যেমন বাগান করা। থাকার ঘরে পর্যাপ্ত আলো রাখা। হাত-পা ম্যাসাজ করে দেয়া, রোগীকে স্পর্শ করা, মাথায় হাত বুলানো, কপালে চুমু দেয়া। হাসিমুখে সামনে দাঁড়ানো। আদরের চাহনিতে রোগী নিজেকে নিরাপদ ভাববে। বিদায় নেয়ার সময় রোগীকে কাজে

ব্যস্ত রাখা, যাতে রোগী একাকী বোধ না করেন। ডায়েরি লেখা কিংবা পুরোনো ডায়েরি থেকে পড়া একটি কাজ হতে পারে।

আলঝেইমার রোগ নিয়ে আমাদের সচেতনতা দরকার কেন? আমাদের সচেতনতা তৈরি হলে রোগী ঠিক সময়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন। শুরুর দিকেই রোগীকে সতর্কভাবে সেবাযত্ন করা যাবে। পরিবারের সদস্য বন্ধু-বান্ধবরা রোগীকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে। রোগীর আচরণে অসন্তুষ্ট হবে না; বরং রোগী হিসেবে তাকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করবে। আলঝেইমার রোগ নিয়ে সচেতনতা তৈরি হলে রোগী সর্বোচ্চ সেবাযত্ন ও সহযোগিতা পেতে পারেন। অন্যথায় রোগী অসহায় অমর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হবেন। পরিবারের আপনজনকে আমরা সর্বোচ্চ সেবাযত্ন, সম্মান, মর্যাদা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গে থাকব, এটুকু বোধ তৈরি করতে হবে।

আলঝেইমার রোগের চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি বলে রোগীর জীবনমান বজায় রাখার জন্য মানসম্মত সেবা প্রয়োজন। মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষিত সেবাকর্মীর সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সেবাকর্মী গড়ে তুলতে হবে। সব হাসপাতাল-ক্লিনিকে আলঝেইমার রোগ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে। রোগী এবং পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে আলঝেইমার রোগী এবং পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং করে স্যার উইলিয়ামস বেভারিজ ফাউন্ডেশন। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতি বছর আলঝেইমার রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেপ্টেম্বর মাসকে সচেতনতার মাস হিসেবে পালন করা হয়। স্যার উইলিয়াম বেভারিজ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে এ মাসটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করে। তারা পত্রিকা, লিফলেট, ভিডিও, র‍্যালি, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠকসহ নানা ধরনের কাজ করে থাকে। এখনই আমাদের সচেতন হতে হবে। সচেতনতা বাড়লে আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কাঙ্ক্ষিত সেবাযত্ন ও মর্যাদা পাবে।

এ বিষয়ে সচেতনতা থাকলে পরিবারের বা ঘনিষ্ঠ কারোর এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে পারা যাবে কি ঘটতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেভাবেই সেবা যত্ন করা যাবে। বিষয়টির দিকে নজর দেয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানানো হলো।

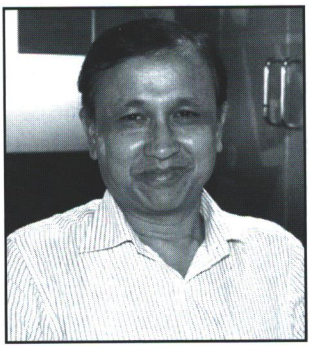

হাসান আলী, জন্ম ১৬ এপ্রিল ১৯৬৩।

বাবা জয়নুল আবেদীন, মা আমেনা খাতুন।

বাবা সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় চাকরি করতেন। স্কুলের পড়াশোনা শুরু করেছিলেন এনজিএফিএফ স্কুলে। বাবার মৃত্যুর পর চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় হর্নিদূর্গাপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, চাঁদপুর সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষক, উন্নয়ন কর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, ব্যবসায়ী হিসেবে দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাজ করেন। বর্তমানে প্রবীণদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি সংগঠনের সাথে যুক্ত। প্রবীণ কথা তাঁর প্রকাশিত প্রথম বই। প্রবীণের গল্প তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় বই।

কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশন

কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশন একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সংস্থা যা বেসামরিক সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ***স্বাধীনতা পুরস্কার*** ও ***একুশে পদকে*** ভূষিত বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড.কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নামে প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গণমানুষের জন্য কাজ করার ব্রত নিয়ে এই ফাউন্ডেশনের সূচনা ও পথ চলা।

কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশন মূলত– (১) তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও পরার্থপরতাসহ মানবিক-সামাজিক গুণাবলি প্রোথিত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। (২) দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবনমান ও মর্যাদা উন্নয়নে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং (৩)। মানবহিতৈষীদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে, পিছিয়েথাকা মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের পাশে দাঁড়ানো সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

সংকল্প (Vision)

এমন একটি সমাজ যেখানে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরার্থপরতায় নিবেদিত হয়ে প্রত্যেকে নিজের জীবন গড়েছে এবং এই গুণগুলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র অনুসরণ ও অনুশীলন করা হচ্ছে। পিছিয়েপড়ারা সুযোগ পেয়ে এবং তা গ্রহণ করে মানব-মর্যাদায় বসবাস করছে অথবা সে পথে এগিয়ে চলেছে।

কার্যপদ্ধতি (Mission)

উপর্যুক্ত কল্প (Vision) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে এই কর্মসূচির ভিত্তিমূল গুণগুলো (মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেম) নিজে অনুশীলন করবেন এবং প্রত্যক্ষ আলোচনা, সেমিনার-কর্মশালার আয়োজন এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে এসব বিষয় ও করণীয় সর্বত্র ছড়িয়ে দেবেন। বিশেষভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের লক্ষ্যভুক্ত করা হবে। পরিকল্পিত বিভিন্ন কর্মসূচির অতিরিক্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট সবাই নিজ দায়িত্বে যার যার অবস্থান থেকে লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। পিছিয়েপড়াদের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।